দৈনিক বাংলা

তারিখ 16 DEC 1992
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বাংলাদেশে শিক্ষা-বাণিজ্য

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

বিশ্বব্যাপী প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের ন্যূনতম প্রার্থিত মান সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলেরই ধারণা আছে। তবু এস-এসসি (বা সমমানের) পরীক্ষা-উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীকে এইচএসসি (বা সমমানের) কোর্সে ভর্তির জন্য এবং এইচএসসি (বা সমমানের) পরীক্ষা-উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীকে বিশ্ববিদ্যালয় (বা সমপর্যায়ের) কোর্সে ভর্তির জন্য প্রায় সব দেশেই ভর্তি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। এর একটা কারণ উচ্চতর পর্যায়ে আসন সংখ্যার সীমাবদ্ধতা এবং আর একটা কারণ নিম্নতর পর্যায়ে পরীক্ষার ফলের ওপর পূর্ণ আস্থার অভাব। আমাদের দেশের কথাই যদি বিবেচনা করি তাহলে আমাদের সবার জানা কয়েকটি প্রসঙ্গ স্মরণ করা যেতে পারে। আমাদের দেশের চারটি শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি/এইচএসসি পরীক্ষার ফলের ওপর পূর্ণ আস্থা থাকলে ঐ পরীক্ষার ঘোষিত মেধাক্রম অনুসারে উচ্চতর পর্যায়ে ভর্তি করা যেত; আবার পরীক্ষার প্রয়োজন হত না। যা প্রয়োজন হত : তা হল জাতীয় চাহিদা অনুসারে উচ্চতর পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি। এবং সকল পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মানের সমতার নিশ্চয়তা বিধান। সেই সঙ্গে সবক'টি উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির কার্যক্রম নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সম্পন্ন করার ব্যবস্থাও সুনিশ্চিত করাও আবশ্যক।—এই হচ্ছে 'আদর্শ ব্যবস্থার' লক্ষ্য। কিন্তু বাস্তবে অবস্থা কি?

স্বাধীনতার দুই দশক পরও 'আদর্শ' ব্যবস্থার কোন কিছুই বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি।

প্রথমতঃ দেশের অর্থনীতি আত্মশক্তি বৃদ্ধির পরিবর্তে প্রায় পুরোপুরি পরনির্ভর হয়ে উঠেছে। ঋণের চক্রবৃদ্ধি সুদের হার ও শর্তের কঠোরতা ক্রমে মূল ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা বিলুপ্ত করে দিচ্ছে; টাকার অবমূল্যায়ন ঘটেছে বহুগুন। পরিণামে জাতীয় পরিবৃদ্ধির সহায়ক উচ্চমানের প্রশিক্ষিত জনগোষ্ঠী সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জাতীয় চাহিদা নির্ণয় ও সেই লক্ষ্যে পরিকল্পনাপ্রণয়নের সুযোগ ও আগ্রহ বিলুপ্তির পথে। জাতীয় চাহিদা নির্ণীত না হওয়ায় উচ্চতর পর্যায়ে যথাযথ পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়নি। পরিণামে সুপ্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ বহন-ক্ষমতার তিনগুনেরও অধিক শিক্ষার্থীর ভারে উদ্দিষ্ট জাতীয় চাহিদা পূরণে ব্যর্থতার মুখোমুখি। এত প্রতিকূলতার মধ্যেও যারা বিভিন্ন পর্যায়ের প্রশিক্ষণ বা ডিগ্রী নিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দ্বার অতিক্রম করছে, তাদেরও যথাযথ কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রায়অনুপস্থিত।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাক্ষেত্রের এই বিপর্যস্ত অবস্থাকে অধিকতর বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেবার লক্ষ্যে জোরদার ভূমিকা পালন করে চলেছে কিছু অপ্রাতিষ্ঠানিক বিভ্রান্তি। প্রথমেই আসে সুপ্রতিষ্ঠিত সরকারী স্কুল ও কলেজের শিক্ষকদেরই একটা অংশের 'প্রাইভেট টিউশনী' নামক সুসংগঠিত কার্যকলাপের কথা। এসব স্কুলের ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকবৃন্দ এইসব সরকারী শিক্ষকদের সরকার অননুমোদিত ক্রিয়া-কর্মের আগ্রহী বা অনাগ্রহী কিন্তু সুবাধ্য পৃষ্ঠপোষক। সরকারী পর্যায়ে এই মসৃণ পৃষ্ঠপোষকতার প্রভাবে মহানগর থেকে দেশের প্রায় সর্ব অঞ্চলে সরকারী-বেসরকারী নির্বিশেষে এসএসসি ও এইচএসসি পর্যায়ের শিক্ষকবৃন্দের বিরাট অংশ 'প্রাইভেট টিউশনী'তে আত্মনিবেদন করেছেন। এদের কেউ কেউ 'কোচিং সেন্টার' নামে বিকল্প প্রতিষ্ঠান চালু করেছেন।। বাংলাদেশে ব্যক্তিমালিকানার এই শিক্ষা-বাণিজ্য প্রায় স্থায়ীরূপ নিতে চলেছে। এই পর্যায়ে শিক্ষা-বাণিজ্যের দ্বিতীয় শাখা খুবই শক্তিশালী—এরা 'নোট' বই প্রকাশক ও ব্যবসায়ী; এরা সরকার-অনুমোদিত নিয়মিত ব্যবসায়ী। এইসব 'নোট' বই ব্যবসায়ীকে যদি 'ট্রেড লাই-সেন্স' দেয়া হয় তবে, 'কোচিং সেন্টারের' মালিকদের এবং 'প্রাইভেট টিউশনী'তে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গকেও 'ট্রেড লাইসেন্স' দেবার কথা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ভেবে দেখা সমীচীন বলে মনে হয়। এই উভয় বণিকগোষ্ঠীর সঙ্গে শিক্ষা মন্ত্রণালয় নয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়েরই যে প্রকৃত সম্পর্ক তা অবিলম্বে ঘোষিত হওয়া প্রয়োজন। বণিক সমিতির সদস্যপদও এঁদের প্রাপ্য।

এর মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা-অবস্থায় নতুন উপসর্গ সংযুক্ত হয়েছে। সরকার ১৯৯২ সাল থেকে এসএসসি পরীক্ষায় কতিপয় বিশেষজ্ঞের পরামর্শে, নিতান্ত সদিচ্ছার বশেই খুব বিজ্ঞানসম্মত বিবেচনা করেই নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের পরীক্ষা প্রবর্তন করেছেন। শুধু তাই নয়, প্রতিটি বিষয়ে পাঁচশত প্রশ্নের 'ব্যাঙ্ক' প্রতিষ্ঠা করেছেন।

এই অতিশয় সাহসী পদক্ষেপে অংকের বিশেষজ্ঞ বা শিক্ষকেরা সম্মত হননি। কিন্তু বাংলা ও ইংরেজীর বিশেষজ্ঞরা এবং/অথবা শিক্ষকেরা (তাদের নাম জানা যায়নি) নৈর্ব্যক্তিকের নিরীক্ষায় অগ্রসর হয়েছেন। ফলে ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে। গত দুই শত বৎসরে বাংলাদেশে বাংলা ও ইংরেজীতে মোট যত পরীক্ষার্থী লেটার নম্বর পেয়েছে এক ১৯৯২ সালেই ঐ দুই বিষয়ে লেটারপ্রাপ্তদের সংখ্যা সম্ভবতঃ তার দ্বিগুনের অধিক।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনস্টিটিউট অব এডুকেশন এ্যান্ড রিসার্চ (আই ই আর) প্রতিষ্ঠাকালের, অর্থাৎ ১৯৬০-এর দশকের মধ্যবর্তীকালের মার্কিন কায়দায় পরীক্ষা নিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর বৃটিশ কায়দায় ফল প্রকাশ করলে এরকম ইতিহাসই সৃষ্টি সম্ভবপর হয়। একজন অভিভাবকের মতে, এ বছরে বাংলাদেশে 'স্টার' প্রাপ্তদের সংখ্যা আকাশের তারার সংখ্যার নাকি কাছাকাছি। খুবই স্বাভাবিক যে, বাংলা ও ইংরেজীতে লেটার নম্বরসহ স্টারপ্রাপ্তদের মধ্যে অনেকেই এইচএসসি ভর্তি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছে।

সরকার 'ভুল বুঝতে পেরে' সম্ভবতঃ 'বিশেষজ্ঞ'দের পরামর্শে, ১৯৯৩ সালের ঐ পরীক্ষা পদ্ধতির কিছু সংশোধন ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু পরীক্ষার্থীদের ক্রিয়া-কর্মের প্রতিক্রিয়ায় সরকার দ্রুত পশ্চাদ অপসরণ করেছেন। এই সিদ্ধান্ত সঠিক হয়েছে। পরীক্ষার অল্পকাল আগে তো নিয়ম বদলানো যায় না। নিয়ম বদলাতে হলে যারা আগামী বছর নবম শ্রেণীতে আসবে তাদের জন্য এখনই ঘোষণা দেয়া উচিৎ।

এইচএসসি ভর্তি পরীক্ষায় স্টারদের অকৃতকার্য হবার ফলে আর একটি 'কুটির বাণিজ্যের' সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এতদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার জন্য 'সাজেশন ও গাইড বই' এবং 'কোচিং' বাণিজ্য চলে আসছিল। এবার এতে এইচএসসি ভর্তি প্রস্তুতি যুক্ত হবার খুবই সম্ভাবনা। এই 'কুটির বাণিজ্য'কে 'বিসিকের' পৃষ্ঠপোষকতায় আনা যায় কিনা তা-ও ভেবে দেখা যেতে পারে।